যোগাযোগের ভূমিকা
(Introduction to Communication)

1.1. যোগাযোগের ধারণা (Concept of Communication)

যোগাযোগ (Communication) হল তথ্য ও মনের ভাব আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া। ***Aristotle***-এর মতে, "Communication is a means of persuasion to influence the other so that the desire effect is achieved." আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যা স্বীকৃত যোগাযোগ মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে শিক্ষামূলক তথ্যাদির সাহায্যে আচরণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করে। সাধারণ অর্থে যোগাযোগ বলতে তথ্যের বা ভাবের আদানপ্রদানকে বোঝায়। এই আদানপ্রদান যখন পারস্পরিক বোঝাপড়ার সৃষ্টি করে বা ব্যক্তিক লক্ষ্য অর্জিত হয় তখনই যোগাযোগ সফল হয়েছে বলা হয়ে থাকে। তাই যোগাযোগ শুধুমাত্র তথ্য, ভাব বা বক্তব্য তুলে ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; অপরপক্ষ যাতে তা বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনীয় প্রত্যুত্তর দিতে পারে তাও যোগাযোগের আওতাভুক্ত বিষয়।

1.1.1. যোগাযোগের অর্থ এবং সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Communication)

যোগাযোগ বা Communication কথাটি লাতিন শব্দ Communicare থেকে এসেছে, এর অর্থ সর্বসাধারণের গোচরে আনা। আস্তে আস্তে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, যেমন—সর্বপ্রথম হল বুলেট তত্ত্ব (Bullet theory—***Schramm***, 1971)। বুলেট তত্ত্বের মতে যোগাযোগ হল এক মন থেকে অন্য মনে অনুভূতি, প্রেরণা, ধারণা এবং জ্ঞান সঞ্চালনের প্রক্রিয়া, গ্রাহক এখানে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু **শ্র্যাম** (***Schramm***) বলেন, "It is the sharing of an orientation toward a set of information sign." Information মানে শুধু তথ্য নয়। তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য যেসব বিকল্প ধারণা রয়েছে সেগুলিকেও বলা হয়েছে।

যোগাযোগ কখনও একমুখী প্রক্রিয়া হতে পারে না। এটি দ্বিমুখী, যখন দুজন ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তখন যোগাযোগ স্থাপন হয়।

সুতরাং যোগাযোগ প্রক্রিয়া—

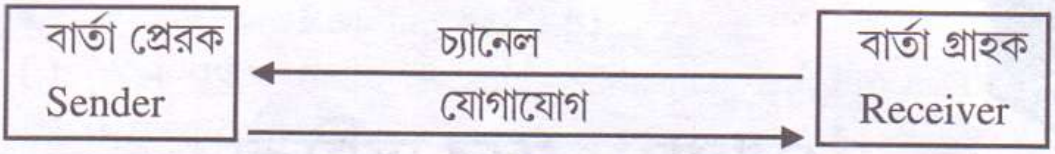

যোগাযোগের সংজ্ঞা (Definition of Communication)

Edger Dale-এর মতে, যোগাযোগ স্থাপন হল পারস্পরিক অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিগুলি বিনিময় করা (Communication is defined as the sharing of ideas and feelings in a mood of mutuality)।

Dewey-এর মতানুযায়ী যোগাযোগ স্থাপন হল পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রক্রিয়া, যতক্ষণ না উভয়ের অভিজ্ঞতা সমান হয় (Communication is a process of sharing experience till it becomes a common possession)।

D Berlo বলেছেন, যোগাযোগ স্থাপন হল প্রেরক ও গ্রাহকের অভিজ্ঞতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উভয়েই একটি সাধারণ ধারণায় উপনীত হয় এবং উভয়েই উপকৃত হয় (Communication is a process of interaction of ideas between the communicator and the receiver to arrive at a common understanding for mutual benefits)।

অধ্যাপক **লুই অ্যালেন** (***Louis Allen***)-এর মতে, "অন্য ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধি জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে একজন ব্যক্তি যা কিছু করে তাই হল যোগাযোগ। যোগাযোগ অভিপ্রায় প্রকাশের সেতু। সুব্যবস্থিত ও ধারাবাহিক বর্ণন, শ্রবণ এবং উপলব্ধি করানো এর অন্তর্গত।"

উপরোক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনা বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা দলের মধ্যে তার অনুভূতি, তথ্য ও মতামত বিনিময়ের প্রক্রিয়াই হল যোগাযোগ। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল একাধিক পক্ষ, ভাব, তথ্য বা সংবাদ এবং এর পারস্পরিক বিনিময়; যার ফলশ্রুতিতে যোগাযোগ হয়ে ওঠে কার্যকর ও ফলপ্রসূ এবং যা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

শিক্ষা কার্যক্রমে যোগাযোগ হল ধারণা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আদানপ্রদান করার প্রক্রিয়া। সঠিকভাবে মানসিক আদানপ্রদান করতে পারলে মানুষের নিজের শক্তি ও সাহস বাড়ে, তেমনি যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ অন্যের সাহস ও মানসিক ক্ষমতা জোগাতে পারে। সংক্ষেপে যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ তার—

1. নিজের ধারণা ও জ্ঞান অন্যকে পৌঁছোয়।
2. নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্যের অভিজ্ঞতার বিনিময় করে।
3. নিজের অভিজ্ঞতা বা অন্যের অভিজ্ঞতার গুণমান নির্ণয় করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী লেখার মাধ্যমে মৌখিকভাবে, অঙ্গাভঙ্গি বা নীরবতা বজায় রেখেও যোগাযোগ সম্পন্ন করে।

1.1.2. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Communication)

1. যোগাযোগ স্থাপন একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এখানে প্রেরক (Communicator) ও গ্রাহক (Receiver) উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়।
2. যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি মাধ্যম থাকা আবশ্যক। মাধ্যম বাচনিক (Verbal) বা অ-বাচনিক (Non-verbal) হতে পারে। কথা বলা, ছবি আঁকা, বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি হল বাচনিক মাধ্যম। অন্যদিকে অঙ্গাসঞ্চালন বা অঙ্গাভঙ্গি হল অ-বাচনিক মাধ্যম।
3. যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটা নির্দিষ্ট আলোচ্য সূচি থাকা প্রয়োজন।
4. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার দ্বারা উভয়েই পরিতৃপ্তি লাভ করে।
5. যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্যসংগ্রহ করতে হয়। কারণ নতুন তথ্য পেতে কিংবা সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকি।
6. যোগাযোগ করতে হবে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য। কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে অনেক সময় দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়।
7. তথ্যসংগ্রহের পর সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তে আসা না গেলে পুনরায় তথ্যসংগ্রহ করতে হয়।
8. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

1.1.3. যোগাযোগের প্রকৃতি (Nature of Communication)

1. **ব্যাপকতা (Pervasiveness):** যোগাযোগের ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী। শুধুমাত্র নির্দেশদান নয় অন্য সকল কাজেই যোগাযোগের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যখন কোনো কাজ করা হয় তার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় পরিকল্পনার। সেই পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক বা ছাত্রছাত্রী বা কর্মচারী সকলেরই প্রয়োজন হয় তথ্যের।

   প্রশাসক কাজের ঊর্ধ্বক্রমিক ভার অর্পণ নীতি (Hierarchy of Responsibilities) অনুসারে যে-কোনো কাজ সঠিক উপায়ে করানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাজ অধস্তনকে অর্পণ করে। যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রশাসকের আদেশ অধস্তন কর্মচারীকে সরবরাহ করে। এর দ্বারা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
2. **নেতৃত্বের ভিত্তি (Basis of Leadership):** যোগাযোগের দ্বারা প্রশাসক বা নেতার সঙ্গে অধস্তন কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অধস্তনের সঙ্গে যদি সঠিক যোগাযোগ থাকে তাহলে সফল নেতৃত্ব স্থাপিত হয়। প্রশাসকের নেতৃত্ব

তারা নির্দ্বিধায় মেনে নেয় এবং কর্মীরা তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সবকিছু অবহিত হতে পারে।

3. **সমন্বয়ের উপায় (Means of Co-ordination):** সমন্বয় ছাড়া কোনো কাজ ভালো হয় না। আর এই সমন্বয় আসে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। কাজের প্রতি শিক্ষক, ছাত্র, প্রশাসক সকলের আন্তরিকতার মনোভাব গড়ে তোলা যায় একমাত্র ভালো যোগাযোগের দ্বারা।
4. **সহযোগিতার ভিত্তি (Basis of Co-operation):** ভালো যোগাযোগের দ্বারা যে-কোনো বড়ো প্রতিষ্ঠানের (যেমন—স্কুলের ক্ষেত্রে Secondary, Higher Secondary, Primary board, DI, SI Office, পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী) বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতি আনুগত্য তৈরি হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির পরিসমাপ্তি ঘটে।
5. **কাজে সন্তুষ্টি (Job Satisfaction):** ভালো যোগাযোগের দ্বারা বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে তথ্যের বা বার্তার উপলব্ধি ও স্বীকৃতি সম্ভব হয়। কর্মীদের মধ্যে কর্ম সন্তুষ্টি লক্ষ করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে যোগাযোগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উপযুক্ত যোগাযোগের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী যে-কোনো কাজের পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে। এর দ্বারা প্রশাসকের প্রতি কর্মীদের কাজে আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত যোগাযোগের দ্বারা কর্মীরা তাদের সকল অভাব, অভিযোগ ও কার্য সম্পাদনের অভিমত পূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণের মাধ্যমে জানাতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ভালো যোগাযোগের উদ্দেশ্য হল জ্ঞাপন করা, উপলব্ধি জাগানো এবং প্রভাব বিস্তার করা।

1.1.4. যোগাযোগের বিভিন্ন শ্রেণিসমূহ (Types of Communication)

যোগাযোগ করার অভিজ্ঞতাগুলিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন—1. আন্তর ব্যক্তিগত (Intra Personal), 2. অন্তর ব্যক্তিগত (Inter Personal), 3. দল (Group) এবং 4. গণ (Mass) যোগাযোগ।

1. **আন্তর ব্যক্তিগত যোগাযোগ (Intra Personal Communication):** যখন এক ব্যক্তি তার নিজের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে আন্তর ব্যক্তিগত যোগাযোগ বলা হয়। যেমন—চিন্তা করা, সমস্যাসমাধান করা, ডায়েরি লেখা প্রভৃতি।
2. **অন্তর ব্যক্তিগত যোগাযোগ (Inter Personal Communication):** যে-কোনো মুখোমুখি যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে প্রয়োজন হয় দুটি লোকের, যেমন—টেলিফোনে কথাবার্তা বলা, সাক্ষাৎকার, চায়ের দোকানে বন্ধুদের মধ্যে কথাবার্তা বলা।

3. **দলীয় যোগাযোগ (Group Communication):** দলীয় যোগাযোগ বলতে বোঝায় দলীয় সভ্যদের নিজেদের মধ্যে এবং দলের সকল সভ্যের সঙ্গে একে অপরের যোগাযোগ। দলগুলি ছোটোও হতে পারে, বড়োও হতে পারে, যেমন—পরিবার, কমিটি ইত্যাদি।

4. **গণ যোগাযোগ (Mass Communication):** এই ক্ষেত্রে যোগাযোগটি গ্রহণ করে বা প্রাপক হয় বৃহৎ জনসংখ্যা, যেমন—জলসা, হাজার লোক একসঙ্গে গান শুনছে বা বেতার ও পোস্টাল যোগাযোগ।

সংগঠনগতভাবে যোগাযোগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. **মুখোমুখি যোগাযোগ (Face to Face or Person to Person Communication):** মুখোমুখি যোগাযোগকে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি যোগাযোগ বলা হয়, এই ধরনের যোগাযোগের সময় একজন বক্তা, অপরজন শ্রোতা হিসেবে থাকে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন ভাষণ দেন এবং শিক্ষার্থীরা শোনে, তখন এই যোগাযোগ সংগঠিত হয়। অনেক সময় মুখোমুখি যোগাযোগকে আন্তর্ব্যক্তিক (Inter-personal) বলা হয়ে থাকে। এই যোগাযোগে শ্রোতারা বক্তার হাবভাব, অঙ্গাভঙ্গি সরাসরি অনুধাবন করতে পারায় বিষয়বস্তু অনেক বেশি সরল করার সুযোগ হয়। এ ছাড়া এই যোগাযোগ মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তা ছাড়া এই যোগাযোগে পড়ুয়ারা নিজের প্রশ্ন ব্যক্ত করার সুযোগ পায়।

2. **লেখা ও পড়ার মাধ্যমে যোগাযোগ (Writing and Reading Communication):** এখানে বই, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি লেখা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের যোগাযোগে শিক্ষার্থীরা লেখকের মনের ভাব সরাসরি প্রত্যক্ষ না করে পরোক্ষে জানে। শিক্ষার্থীরা লেখকের বক্তব্য বা লেখা পড়ে বোঝে বা আনন্দ পায়। কিন্তু কোথাও সংশয় বা প্রশ্ন জাগলে তা লেখকের কাছ থেকে তা জেনে কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। তবে লেখক বা পাঠক একে অন্যের মনের খবর বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানতে পারেন।

3. **দর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ (Visualizing-Observing Communication):** টিভি, সিনেমা, নাটক, বহুধামাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে বক্তার সঙ্গে শ্রোতার যে সম্পর্কস্থাপন হয় তাকে দর্শন-পর্যবেক্ষণ যোগাযোগ বলা যায়। এখানে দর্শকের সঙ্গে বক্তার সরাসরি কথা বলার সুযোগ না হলেও শ্রোতারা বক্তার হাবভাব, অভিব্যক্তি ইত্যাদি জানার সুযোগ পায় বলে বক্তার সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক তৈরি হয়। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দর্শক বক্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় বলে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নানা রকমের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

1.2. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার নীতিসমূহ (Principles of Communication Process)

যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে কার্যকারী করে তুলতে না পারলে শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে কার্যকারী করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি মেনে চলতে হবে।

1. **প্রস্তুতি ও প্রেষণার নীতি (Principles of readiness and motivation):** যোগাযোগ প্রক্রিয়া কার্যকারী করার জন্য প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়েরই মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। গ্রাহককেও যথাযথভাবে প্রেষিত করতে না পারলে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা স্তিমিত হয়ে আসে।
2. **দক্ষতার নীতি (Principles of Competency):** যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয় বিশেষ কোনো বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। ওই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রেরকের যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া দক্ষতার সঙ্গে উক্ত বিষয়বস্তু উপস্থাপন না করলে তা কখনোই গ্রাহকের মনে দাগ কাটবে না। সেইজন্য বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রেরককে অর্জন করতে হবে।
3. **ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নীতি (Principles of Interaction):** যেহেতু যোগাযোগ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, তাই এর সফলতা অনেকটা নির্ভর করে প্রেরক ও গ্রাহকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাত্রা যত বেশি হবে ততই প্রেরক ও গ্রাহক পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়াও তত কার্যকারী হবে। তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ার উপর এত জোর দেওয়া হয়।
4. **মাধ্যম নির্বাচনের নীতি (Principles of Selection of Media):** যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্থকতা উপযুক্ত মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। যদি মাধ্যম উপযুক্ত না হয় তাহলে তা গ্রাহকের উপলব্ধিতে সহায়তা করে না। ফলে যোগাযোগ চক্র স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাই প্রেরককে এমন মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে যাতে গ্রাহক সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে।
5. **উপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতি (Principles of Selection of Appropriate Contents):** যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সফলতা বিষয়বস্তুর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিষয়বস্তু যদি প্রেরক ও গ্রাহক উভয়ের কাছে দুর্বোধ্য হয় তাহলে যোগাযোগের চক্রটি বিঘ্নিত হবে। তা ছাড়াও বিষয়বস্তুটির অবশ্যই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের পরিণমনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
6. **ফিডব্যাকের নীতি (Principles of Feedback):** যোগাযোগের ধারা গ্রাহকের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফিডব্যাকের উপর নির্ভরশীল। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যদি উপযুক্ত ফিডব্যাক পান তাহলে তিনি তাঁর নিজের কাজের উপর পরিতৃপ্তি লাভ করেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি তাঁর পরবর্তী কাজগুলি সম্পাদন করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত নীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালিত হলে যোগাযোগ চক্র দৃঢ় হয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে।

1.3. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদান (Elements of Communication)

যোগাযোগের উপাদানগুলি হল—1. যোগাযোগের উৎস বা প্রেরক, 2. যোগাযোগের বিষয়বস্তু বা তথ্য, 3. যোগাযোগের মাধ্যম, 4. গ্রাহক, 5. ফিডব্যাক, 6. যোগাযোগের সহায়তা বা বাধা প্রদানকারী উপাদান।

1. **প্রেরক (Sender):** যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রেরকের কাছ থেকে। এই উৎস বিভিন্ন রকমের ধারণা, চিন্তাভাবনা, মতামত ইত্যাদি প্রেরণ করে থাকে। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষককেই প্রেরক হিসেবে গণ্য করা হয়।
2. **বিষয়বস্তু (Content):** প্রেরক যে সমস্ত অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি অন্যজনকে প্রেরণ করেন তাই হল বিষয়বস্তু। শিক্ষণ-শিখন ক্ষেত্রে পাঠক্রম হল বিষয়বস্তু।
3. **মাধ্যম (Media):** বিষয়বস্তুকে কার্যকারীভাবে সঞ্চালন করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম একান্ত আবশ্যক। মাধ্যম দুই রকমের হতে পারে। যেমন—বাচনিক মাধ্যম (Verbal) ও অ-বাচনিক মাধ্যম (Non-verbal)। যে-কোনো বিষয়বস্তুকে প্রেরক ভাষার মাধ্যমে বা অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে গ্রাহকের সামনে উপস্থাপন করেন। সঞ্চালন কৌশল হিসাবে বর্তমানে প্রেরকরা encoding-এর সহায়তা নিয়ে থাকেন। encoding হল এমন একটি কৌশল যার দ্বারা প্রেরক সাংকেতিকভাবে কিছু বিষয়বস্তু গ্রাহকের মধ্যে সঞ্চালন করেন।
4. **গ্রাহক (Receiver):** যার উদ্দেশ্যে প্রেরক কিছু বার্তা প্রেরণ করেন তিনিই গ্রাহক। তিনি encoding বার্তা decode করেন এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করেন। শিক্ষণ শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা হল গ্রাহক।
5. **ফিডব্যাক (Feedback):** ফিডব্যাক বলতে সাধারণ গ্রাহকের প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো "encoded" বার্তা গ্রহণ করার পর গ্রাহক কীভাবে সেই বার্তার প্রতি প্রতিক্রিয়া করল তাই হল ফিডব্যাক। এই ফিডব্যাকের সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বিচার করা হয়।
6. **যোগাযোগের সহায়তা বা বাধা প্রদানকারী উপাদান (Facilitation or Barring of Communication):** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় এমন কিছু বিঘ্নকারী চল (Variable) আছে যেগুলি যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত অথবা বাধাদান করতে পারে। সেগুলি হল গ্রাহক ও প্রেরকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, যোগাযোগের পরিবেশ ইত্যাদি। শিক্ষণের পরিবেশ অনুকূল হলে যোগাযোগ

প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকারী হয়। আবার পরিবেশ প্রতিকূল হলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হয়।

1.4. যোগাযোগ প্রক্রিয়াসমূহ (Process of Communication)

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে—

(i) উৎস (Sender) (ii) নির্দিষ্ট চিহ্ন বা সংকেত
(iii) এগুলি নিয়ে সার্বিক চিন্তা (iv) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং
(v) সংগঠিত করা।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূল ধাপগুলি হল—

1. **প্রেক্ষাপট (Content):** প্রতিটি সংযোগসাধন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট স্থান গ্রহণ করে। যেসব উপাদান সংযোগসাধন প্রেক্ষাপটকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল—বস্তুগত পরিবেশ, প্রক্ষোভ, জনগণের প্রতিক্রিয়া তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত প্রভৃতি। এই উপাদানগুলি পরিস্থিতি থেকে পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়।
2. **উৎস (Source):** সংযোগসাধন প্রক্রিয়া একটি উৎস থেকে শুরু হয়। এটি বস্তু, ঘটনা বা ব্যক্তি যেভাবেই থাকুক না কেন সকল সময়ই কিছু না কিছু নথিবদ্ধ তথ্য সরবরাহ করে।
3. **বার্তা প্রেরণ (Sending message):** উৎস বা প্রেরক কোনো শব্দ বা ভাষা বা সংকেতের মাধ্যমে বার্তা পাঠান সংকেতবদ্ধ রূপে।
4. **মাধ্যম/পথ (Channel):** মাধ্যম বা চ্যানেল হল একটি পথ যা প্রেরিতের নিকট থেকে গ্রাহকের নিকট সংবাদ বা বার্তা প্রদান করে। মাধ্যম হল দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি সব ধরনের ইন্দ্রিয়ের। এটি শ্রবণ, দর্শন বা শ্রবণ-দর্শন উভয় প্রকারের হতে পারে।
5. **সংকেত (Symbol):** এগুলি গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কতকগুলি প্রতীক যা গ্রাহক ও প্রেরক উভয়েই গ্রহণ করতে পারে।
6. **সংকেত যুক্তকরণ (Encoding):** এটি হল গৃহীত প্রতীকের বিন্যাস দ্বারা কোনো কোনো ধারণা বা অনুভূতিকে সংকেতযুক্ত বার্তায় পরিণত করে।
7. **বার্তা গ্রহণ (Receiving of message):** যে সংবাদটি প্রেরণ করা হয় সেটিকে গ্রাহক নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করে অর্থাৎ সংকেতমুক্ত (Decoding) করে উপলব্ধি করে।
8. **সংকেত মুক্তকরণ (Decoding):** এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা গ্রাহক উৎস থেকে প্রেরিত বার্তাকে সংকেতমুক্ত করে অর্থবহ করে তোলে।
9. **প্রতিসংকেত (Feedback):** যে বার্তাটি প্রেরণ করা হল সেটি ঠিকমতো গ্রাহকের কাছে পৌঁছেছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। প্রেরকের কাছ

থেকে প্রাপক আর প্রাপকের কাছ থেকে প্রেরকের কাছে পুনরায় বার্তা পাওয়া নিশ্চিত করাকে প্রতিসংকেত বা Feedback বলে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে কতকগুলি মডেল আছে। সবচেয়ে সরল মডেলটি হল 'যোগাযোগের সরলরৈখিক মডেল' (Linear Model of Communication—***Dimbleby*** and ***Burton***—1985)। এই মডেলটি হল নিম্নরূপ—

উৎস	→	সংকেতবদ্ধ করা	→	বার্তা	→	সংকেতমুক্ত করা	→	গন্তব্য
(Source)		(Coding)		(Message)		(Decoding)		(Destination)
সমু		কথা বলে		"কেমন আছেন?"		শোনেন		মলয়।

এই সকল মডেলে দেখা যাচ্ছে একজন প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছে কোনো গ্রাহকের কাছে। বিশেষ কোনো চ্যানেলের মাধ্যমে বার্তাটি কোনো সংকেত (Code)-এর সাহায্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। বার্তাটি কোড, মৌখিক বা অমৌখিক কোনো চিহ্ন হতে পারে। এটি গ্রাহক সংকেতমুক্ত করে নিচ্ছে। এই সরল যোগাযোগ প্রক্রিয়াতে কোনো জটিল মানব আচরণের বাহ্যিক প্রকাশ হয় না।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও একটি উন্নতমানের মডেল হল যোগাযোগের বর্ণনা প্রাসঙ্গিক মডেল।

বর্ণনা প্রসঙ্গ (Context)

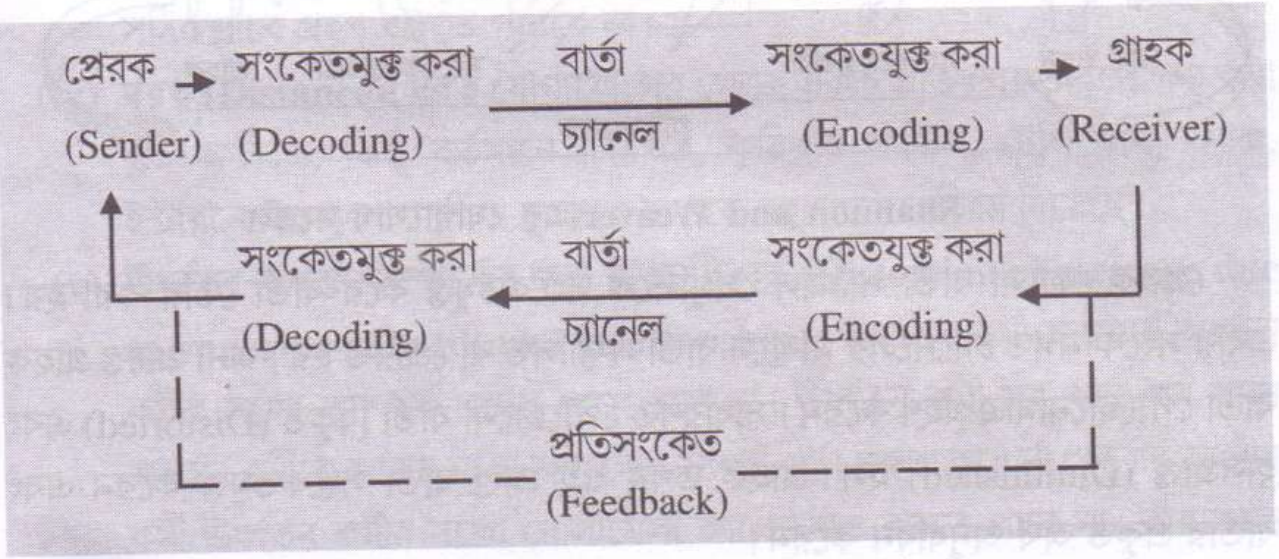

প্রেরক: যিনি বার্তার উৎস, তিনি হয়তো প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে থাকার জন্য হতে পারেন। তিনি কোনো বার্তা পাঠাতে চাইছেন। বার্তা হতে পারে কোনো চিন্তা, ধারণা, তথ্য, অনুভূতি।

সংকেতবদ্ধ করা: প্রেরকের মনের ধারণাগুলিকে সংকেতযুক্ত (Encoding) করে বার্তা তৈরি করা হয়।

চ্যানেল: এবার সংবেদনগত চ্যানেলের মাধ্যমে বার্তা সঞ্চালিত বা প্রেরিত হয়। Encoding হল এমন একটি কৌশল যার দ্বারা প্রেরক সাংকেতিকভাবে কিছু বিষয়বস্তু গ্রাহকের মধ্যে সঞ্চালিত করেন।

সংকেতমুক্ত করা: বার্তাটি সংকেতমুক্ত করা হয়।

গ্রাহক: যার উদ্দেশ্যে প্রেরক কিছু বার্তা প্রেরণ করেন তিনিই গ্রাহক। অন্য প্রান্তে গ্রাহক বার্তা পৌঁছোনো মাত্র গ্রহণ করলেন।

এই মডেলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলাকালীন বার্তা প্রেরক ও বার্তা প্রাপক উভয়েই সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্ণনা প্রাসঙ্গিক মডেল (Contextual) বা বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ও প্রতিসংকেত সহ সরলরৈখিক মডেল আসলে হল বিনিময়ের মডেলের বিস্তৃত রূপ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি নতুন মাত্রা পরিস্থিতি (Situation) বা পারিপার্শ্বিকতা। এই প্রক্রিয়াতে প্রতিসংকেত যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিসংকেত হল কোনো Encoded বার্তা গ্রহণ করার পর গ্রাহক কীভাবে সেই বার্তার প্রতি প্রতিক্রিয়া করল। এই ফিডব্যাকের সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বিচার করা হয়।

যোগাযোগ মডেল: শ্যানন এবং ওয়েভার মডেল

Shannon and Weaver-এর যোগাযোগ মডেল

প্রেরক কোনো বার্তা পাঠালে সেগুলিকে সংকেতযুক্ত করে বার্তা তৈরি করা হয়। এবার সংবেদনগত চ্যানেলের মাধ্যমে বার্তা সঞ্চালিত বা প্রেরিত হয়। অন্য প্রান্তে গ্রাহক বার্তা পৌঁছোনোমাত্র গ্রহণ করেন। সাধারণত পৌঁছোনো বার্তা বিকৃত (Distorted) এবং হ্রাসপ্রাপ্ত (Diminished) হল। গ্রাহক তখন ওই প্রাপ্ত বার্তা সংকেতমুক্ত করেন এবং বার্তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করেন।

1.5. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Barriers of Communication Process)

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সিস্টেমের মধ্যে এমন কিছু বিঘ্নকারী চল আছে যেগুলি যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে, এগুলিকে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা বলে ধরে নেওয়া হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতাগুলি হল নিম্নরূপ—

1. **প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা:** গোলযোগ, অদৃশ্যতা, পরিবেশগত ও শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, দুর্বল স্বাস্থ্য।

2. **ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা:** শব্দের ব্যবহার, অস্পষ্ট প্রতীক বা সংকেত, অস্বচ্ছ গ্রাফিক্স।
3. **মানসিক প্রতিবন্ধকতা:** কুসংস্কার, বীতরাগ, অমনোযোগ, প্রত্যক্ষণে ত্রুটি, কৌতূহল, উৎকণ্ঠার অনুভূতি, অসফল অভিজ্ঞতা।
4. **পটভূমিগত প্রতিবন্ধকতা:** পূর্বার্জিত শিখন, সাংস্কৃতিক পার্থক্য, অতীত কর্ম পরিবেশ যেখানে একজন বার্তার Authenticity আশা করে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

(i) **অমনোযোগিতার জন্য প্রতিবন্ধকতা (Barriers due to perfunctionary):** প্রেরক যে বার্তা প্রেরণ করে গ্রাহক যদি সেটি মনোযোগ সহকারে গ্রহণ না করে তাহলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

(ii) **ভিন্নার্থক বার্তা বিকৃতি (Semantic distortion):** প্রতিটি বার্তা মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধির নিরিখে বিচার করে। প্রেরকের বার্তা গ্রাহকের কাছে সব সময় সঠিক অর্থ বহন করে না। প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সমঝোতার অভাব তৈরি হয়। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম কারণ।

(iii) **অস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি (Ambiguous expression):** যোগাযোগের বার্তা সর্বদা সহজ, সরল হতে হবে। বার্তা যদি সহজ, সরল ভাষায় না হয় তাহলে তা বিকৃত হয়ে পড়বে। প্রেরকের প্রকাশভঙ্গি যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে গ্রাহক তা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

(iv) **দূরত্ব (Distance):** দূরত্ব যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতারূপে গণ্য করা হত অতীতে, কিন্তু বর্তমানে চিঠিপত্র, কুরিয়ার সার্ভিস, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেটের সুযোগসুবিধা দূরত্বের বাধাকে বহুলাংশে কমিয়ে দিয়েছে।

(v) **ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের জন্য বার্তা বিকৃতি (Distortion of message due to superior-subordinate relationship):** ঊর্ধ্বতন কর্মী সবসময় অধস্তন কর্মীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে না। ঊর্ধ্বতন কর্মী সব বার্তা সব সময় অধস্তন কর্মীকে জানায় না বা জানালেও সম্পূর্ণ বার্তা প্রকাশ করে না। আবার অধস্তন কর্মী ঊর্ধ্বতন কর্মীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনাও করতে পারে না। তার ফলে বার্তার বিকৃতি ঘটে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

(vi) **পরিবর্তনে বাধা (Resistance to change):** মানুষ স্বভাবগত কারণে পরিবর্তন বিমুখ। পুরোনো ধ্যানধারণা নিয়ে চলতে ভালোবাসে। প্রচলিত সিস্টেমকে আধুনিকতার ছোঁয়ায় মেনে নিতে তারা অক্ষম। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা কোনো বার্তা নিতে চায় না।

(vii) **বার্তা প্রকাশে ব্যর্থতা (Failure to communicate):** আলস্যের কারণে সঠিক সময়ে পরিবেশন করা, সঠিক বিষয় নির্বাচনে ব্যর্থতার জন্য বার্তা প্রকাশে ব্যর্থতা আসে।

এ ছাড়া, যোগাযোগের সময় বক্তা বা শ্রোতার অধিক কথা বলা, দ্রুত এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যাওয়া, একই বিষয় নিয়ে বারবার বলা, বক্তার উচ্চারণ ও বলার ধরন পরিষ্কার না হলে বক্তব্য আকর্ষণীয় হয় না। এগুলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার অন্যান্য কারণ হিসেবে গণ্য হয়।

1.6. শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication System in Classroom)

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়াকে শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার্থীদের সাফল্য তথা শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

1.6.1. শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকারভেদ (Different Types of Classroom Communication)

শ্রেণিকক্ষে সাধারণত দুটি উপায়ে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকেন। যেমন—

1. বাচনিক যোগাযোগ (Verbal Communication) ও
2. অবাচনিক যোগাযোগ (Non-verbal Communication)।

1. বাচনিক যোগাযোগ (Verbal Communication)

বাচনিক যোগাযোগের মূল উপাদান হল ভাষা। প্রতিটি মানুষ ভাষার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে। প্রতিটি সমাজ তার নিজস্ব ভাষা তৈরি করেছে। ভাষার সাহায্যে আমরা 3টি উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করি। যেমন—

(ক) মৌখিক উপায় (Oral means)

(খ) লিখিত উপায় (Written means)

(গ) মৌখিক ও লিখিত দুটোই (Oral and Written)।

লিখিত উপায়ে শিক্ষক বা প্রেরক তার চিন্তাভাবনাগুলি চক-বোর্ডের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হয়।

একথা ঠিক যে, শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনকালে শুধুমাত্র মৌখিক উপায়ে বা শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করা যায় না। বিষয়বস্তুর চরিত্রের উপর নির্ভর করে শিক্ষককে মৌখিক ও লিখিত উপায়ের সমন্বয়সাধন করতে হয়।

2. অবাচনিক যোগাযোগ (Non-verbal Communication)

কোনো ভাষার প্রয়োগ না করেও যখন প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তখন তাকে অবাচনিক যোগাযোগ (Non-verbal Communication) হিসেবে অভিহিত করা হয়। অবাচনিক যোগাযোগ মূলত শ্রবণজনিত প্রতিবন্ধী বা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণ শ্রেণিকক্ষেও শিক্ষক মহাশয়কে বাচনিক যোগাযোগের পাশাপাশি অবাচনিক উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, শিক্ষক কী কী কৌশল অবলম্বন করে অবাচনিক যোগাযোগ স্থাপন করবেন। আমরা এখন সেগুলিই আলোচনা করব।

(ক) **মুখমণ্ডলীর অভিব্যক্তি (Facial expression):** মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি মানুষের মনের সমস্ত অনুভূতিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করে। যদি ব্যক্তি মানসিক চাপ বা উদ্‌বেগের মধ্যে থাকে তাহলে তা অবশ্যই মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হবে। আবার ওই ব্যক্তি যখন আনন্দে থাকে বা তার মধ্যে মানসিক শান্তি বিরাজ করে, সেটাও তার মুখমণ্ডলে দৃশ্যমান হয়। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তুর মমার্থকে মুখমণ্ডলে প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাই মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিকে অবাচনিক যোগাযোগের প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

(খ) **চোখের ভাষা (Language of the eye):** মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তির ন্যায় চোখের ভাষাও একটা গুরুত্বপূর্ণ অবাচনিক যোগাযোগের উপায়। চোখের ভাষা সমাজ ও সংস্কৃতিনিরপেক্ষ, অর্থাৎ যে-কোনো সমাজের মানুষের চোখের ভাষা একই অর্থ বহন করে। চোখের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের সমস্ত অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

চোখে চোখে সংস্পর্শ (eye-to-eye contact) কার্যকারী যোগাযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে পাঠদান পরিচালনা করেন। এতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের গতিবিধি নজর রাখা সম্ভব হয় তেমনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও সম্ভব হয়। শিক্ষকের চক্ষু সঞ্চালন শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাকের প্রশংসা বা ভর্ৎসনা প্রকাশ করে।

(গ) **শরীরী ভাষা (Body language):** আমাদের শরীর অনুভূতি, চিন্তাভাবনা ও ক্ষমতাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন অঙ্গসঞ্চালন বা অঙ্গভঙ্গির সমন্বয়ে শরীরী ভাষা গঠিত। এই ধরনের শরীরী ভাষা প্রয়োগ করে আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতারা তাঁদের কাজের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। অনুরূপভাবে শিক্ষক মহাশয়ও তাঁর শরীরী ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়বস্তু সঞ্চালন করে থাকেন।

❑ শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উপাদান—হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার (Components of Educational Technology—Hard ware and Soft ware) ঃ

শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মূলস্তম্ভ হল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার। বিভিন্ন গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে হার্ডওয়্যার (Hard ware) ও সফটওয়্যার (Soft ware) নির্ভর কৌশলগুলি শিক্ষণ-শিখনের কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মূলস্তম্ভ দুটি কেবলমাত্র শিক্ষণ-শিখনের উপস্থাপন স্তরকে আকর্ষণীয় করে তোলে তাই নয়, এগুলি শিক্ষার প্রসার, উন্নয়ন ও প্রাণ সঞ্চারে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়।

○ হার্ডওয়্যার (Hard ware) ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগকে হার্ডওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞান বা Hard ware Technology বলা হয়। অর্থাৎ যান্ত্রিক বিষয়বস্তু (Mechanical Materials) ও যন্ত্রপাতির (Equipments) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে তার উপজাত হল এই হার্ডওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞান। এই হার্ডওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে—

(১) *শ্রবণভিত্তিক উপকরণ* ঃ রেডিয়ো, টেপরেকর্ডার, টেলিফোন, অডিও এবং ভিডিও ডিস্ক ইত্যাদি।

(২) *দর্শনভিত্তিক উপকরণ* ঃ বই, খাতা, চক, বোর্ড, চার্ট, মডেল, ফিল্ম স্ট্রিপ, স্লাইড, ট্রান্সপারেন্সি, প্রদর্শনী সামগ্রী ইত্যাদি।

(৩) *শ্রবণ ও দর্শনভিত্তিক উপকরণ* ঃ টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ফিল্মস, ভিডিও টেপ, কম্পিউটার ইত্যাদি।

● হার্ডওয়্যারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hard ware) ঃ

১। হার্ডওয়্যারের উৎস হল শিক্ষা-বিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়ার প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ।

২। হার্ডওয়্যারগুলি হল শ্রবণ, দর্শন ও শ্রবণ ও দর্শনভিত্তিক উপকরণ, গণমাধ্যম, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও গ্যাজেট।

৩। হার্ডওয়্যার পদ্ধতিতে প্রযুক্তির সাহায্যে অধিক শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সংখ্যা, শ্রেণি সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ না বাড়িয়ে বহু লোককে একসঙ্গে এবং আরও দ্রুত শিক্ষিত করা সম্ভব।

৪। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার খরচ অনেক কম।

৫। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষণ-শিখনের ব্যবস্থা করা যায়।

৬। ব্যক্তি ও সমাজের শিক্ষাগত চাহিদা চরিতার্থ হয়।

৭। শিক্ষার্থীর সক্ষমতা অনুযায়ী সর্বাধিক সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে।

৮। শিক্ষণীয় বস্তুকে সজীব, স্পষ্ট ও আনন্দপূর্ণ করে তোলে।

৯। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া।

১০। স্বয়ং-শিখনের (Self-learning) সুযোগ অনেক বেশি।

১১। শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ফিড্‌ব্যাক সরবরাহের প্রক্রিয়ার সুযোগ বেশি।

১২। শিক্ষার্থীদের শিখনকে কার্যকারী করে তোলার জন্য প্রেষণাসঞ্চারী ব্যবস্থার (Reinforcement technique) সুযোগ অনেক বেশি।

○ সফটওয়্যার (Soft ware) ঃ

আধুনিককালে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নত করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ ধারা পরিবর্তন করার জন্য যে শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞান ব্যবহার করা হয়, তাকে সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞান বলা হয়। সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উৎস হল আচরণমূলক বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ যা শিক্ষা মনোবিদ্যার সঙ্গে জড়িত। *স্কিনার* ও অন্যান্য মনোবিদ এবং চিন্তাবিদগণ সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অন্তর্গত হল—

(১) শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়বস্তু ও যোগাযোগ মাধ্যমের (Communication) সমন্বয় ঘটিয়ে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা।

(২) শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে শিখনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করে উদ্দেশ্যগুলির আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।

(৩) প্রযুক্তিবিদ্যা বা হার্ডওয়্যারের সাহায্যে নির্দেশনা দানের জন্য শিক্ষণ-শিখন কৌশল নির্বাচন করে সেগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকারী করে তোলা সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(৪) সফ্‌টওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে নির্দেশনা পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে উদ্ভব হয়েছে সাইবারনেটিক মনোবিদ্যা (Cybernetic Psychology), নির্দেশনামূলক প্রযুক্তিবিজ্ঞান (Instructional technology), শিক্ষণ-শিখন তত্ত্ব (Teaching-learning theory) এবং সিস্টেম অ্যানালিসিস (System analysis)। এ ছাড়াও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বিভিন্ন শিক্ষণ মডেল (Teaching model), মাইক্রো শিক্ষণের কৌশল (Micro teaching), দলগত শিক্ষণের কৌশল (Team teaching) ইত্যাদি।

সুতরাং সফটওয়্যার প্রযুক্তি বিকাশে শিক্ষণ-শিখন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা পরিকল্পনা (Instructional design) ব্যবহার করা হচ্ছে। সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে **ডেভিস** (Davis) বলেছেন, "This software view of educational technology is closely associated with the modern principles of programme learning and is characterised by task-analysis, writing precies objectives, selection of appropriate learning strategies, reinforcement of correct responses and constant evaluation." —সুতরাং, সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিজ্ঞান হল শিক্ষার আচরণমূলক বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক দিকসমূহের বিষয়।

○ শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞানের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পার্থক্য (Distinction between Hardware & Software) :

হার্ডওয়্যার (Hardware)	সফটওয়্যার (Software)
১। ভৌতবিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগের উৎস।	১। আচরণগত নীতিগুলির প্রয়োগের উৎস শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যমূলক আচরণ সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
২। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ রেডিয়ো টেপরেকর্ডার, স্লাইড, ফিল্‌ম স্ট্রিপস, কম্পিউটার ইত্যাদি এর অন্তর্গত।	২। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিখন সহায়ক উপকরণের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ প্রোগ্রাম শিখন, টাস্ক বিশ্লেষণ, পুনঃশিক্ষণ, সংশোধন ও ক্রমাগত মূল্যায়ন ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

হার্ডওয়্যার (Hardware)	সফটওয়্যার (Software)
৩। এটি সম্পর্কযুক্ত প্রযুক্তিবিজ্ঞান।	৩। এটি নির্দেশনামূলক আচরণগত প্রযুক্তি। সুতরাং ইহা গঠনমূলক মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তিবিজ্ঞান। অর্থাৎ শিক্ষার্থী উদ্দেশ্যমূলক আচরণ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৪। শিক্ষণ বা নির্দেশনার কাজে সহায়তা করার জন্য ইলেকট্রিক এবং যান্ত্রিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।	৪। শিক্ষণ বা নির্দেশনার কাজে সহায়তার জন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত আচরণমূলক নীতির প্রয়োগ করা হয়।
৫। এটি বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বহু মাধ্যমের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	৫। শিক্ষার্থীর শিখন ও শিক্ষণ কার্যের মধ্যে সমন্বয় গঠন করতে সহায়তা করে। যেমন, বিভিন্ন প্রোগ্রাম শিখন, টাস্ক বিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি শিখন, শিখন স্ট্র্যাটেজি নির্বাচন, পুনঃশক্তির সঞ্চার ও মূল্যায়ন।